বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের অন্যতম সমাজসংস্কারক হিসেবে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন (১৮৫৬) প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, যা বাংলা ও ভারতের সামাজিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই আইন বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীল চিন্তাধারার ফসল, যা বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহকে বৈধতা দেয় এবং তাদের সামাজিক ও আর্থিক পুনর্বাসনের সুযোগ করে দেয়। গবেষণাটি বিশ্লেষণ করেছে কীভাবে এই আইন বাংলার প্রচলিত সামাজিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে নারীদের প্রতি বিদ্যমান কুসংস্কার ও বঞ্চনাকে ভেঙে নতুন সমাজের পথ প্রশস্ত করেছে। আইনটি কেবল নারীর অধিকার ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক ছিল না, বরং তা নারী শিক্ষা ও তাদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় আরও আলোকপাত করা হয়েছে বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম, আইনের প্রণয়ন প্রক্রিয়া, এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের ওপর, যা শুধু বাংলার নয়, গোটা ভারতীয় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল।

সূচক শব্দঃ বিধবা বিবাহ, হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন, সমাজ সংস্কার, নারী অধিকার, প্রগতিশীল আন্দোলন।

লেখক

ড. জয়িতা সাহা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
গঙ্গারামপুর কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
jayeeta.saha9@gmail.com

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

মূল প্রবন্ধ

ভারতবর্ষের সমাজজীবনে আধুনিক জীবনবোধের প্রাণপ্রদীপ হিসেবে সর্বপ্রথম যে-মানুষটির কথা আমাদের মনে আসে, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি-যে কেবল ধর্মীয় চিন্তামুক্ত মানবতাবাদের বলিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন তা নয়, বাস্তবে অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি তাঁর এই বোধকে জীবন্ত রেখেছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। দেশ যখন ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতায় আবদ্ধ, জীর্ণ, ঠিক সেই সময়ই বিদ্যাসাগর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে জীবনবোধকে প্রদীপ্ত করার অসমসাহসী কাজ শুরু করেন। বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন আদর্শ সর্বদাই মানবচরিত্রে প্রাণ পায়। যে কোনও সমাজ তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সৃষ্টি করতে চায় একদল নতুন প্রাণ, যারা জীর্ণ পুরাতনকে অস্বীকার করার অদম্য সাহস রাখে এবং নতুনকে জীবনে গ্রহণ করার মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে। বিদ্যাসাগর ছিলেন ঠিক সেইরকম একজন অদম্য সাহসী অজেয় পুরুষ।

ঊনবিংশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় নানান ধর্মীয় দেশাচার ও বিধিনিষেধের বেড়াজালে নারীদের জীবন আবদ্ধ ছিল। ঠিক এইসময়ে সমাজে নারীদের উন্নতির অগ্রদূত হয়ে এলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ডিরোজিও ও তাঁর নেতৃত্বাধীন ইয়ংবেঙ্গল। এইসময় বাংলায় নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বাল্যবিধবা, সতীদাহ এবং বেশ্যাবৃত্তি এই সমস্ত পাপ চক্রে নারীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নারীদের অশিক্ষা।

১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজা রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছিল, কিন্তু তাতে নারীদের অবস্থার উন্নতি বিশেষ পরিলক্ষিত হয়নি, বরং সমাজে বিধবাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় সমাজে বাবু-সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে বিধবা মেয়েরা নিজেদের ব্রহ্মচর্য পালনে ব্যর্থ হতে থাকে এবং সমাজ ভ্রূণহত্যা, গর্ভপাতের মত নিষিদ্ধ কাজকর্মে পঙ্কিল রুদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ সমাজের কাছে ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইয়ংবেঙ্গল ১৮৩৬ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় কুলীন ব্রাহ্মণদের এই বহুবিবাহ ব্যবস্থাকে অনাবৃত করেছিল, কিন্তু সমাজ থেকে এই বহুবিবাহকে কিভাবে উৎখাত করা সম্ভব, তার উপায় তাঁদের জানা ছিল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় উপলব্ধি করলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশাচার, লোকাচারে আবদ্ধ সমাজকে যদি রক্ষা করতে হয়, তা হলে সর্বাগ্রে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজে বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার জন্য ঘটতে থাকা পাপাচার তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি উপলব্ধি করলেন যে ব্রহ্মচর্য পালন ছাড়া বিবাহই বিধবাদের মুক্তির একমাত্র পথ।[১]

সংস্কৃত বিষয়ে পণ্ডিত হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সহজেই কোনটি আসল, কোনটি নকল, কোনটি প্রাসঙ্গিক, কোনটি সেকেলে, কোনটি বহুবর্ষব্যাপী চলমান, কোনটি সংকীর্ণ নিয়ম তা বুঝতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে দূর করতে শাস্ত্রের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যাকেই অবলম্বন করলেন। তবে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বিধবাবিবাহের মত নিয়মের ক্ষেত্রে সম্মতির চেয়ে নিষেধাজ্ঞাই বেশী ছিল, সে-কথা তিনি বুঝেছিলেন, তাই যে-কোনও সংস্কৃত পুস্তককে তিনি মান্যতা দেননি। সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে কুড়িজন ধর্মশাস্ত্রপ্রবক্তা-প্রণীত ধর্মশাস্ত্রকেই মান্যতা দিয়েছিলেন। এই কুড়িটি ধর্মশাস্ত্রের প্রবক্তা হলেন মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত,

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

দক্ষ, গোতম, শতাতপ, বশিষ্ঠ। এঁদের প্রণীত ধর্মশাস্ত্রে যেসকল ধর্ম নিরূপিত হয়েছে, ভারতবর্ষের লোক সেই সকল ধর্ম অবলম্বন করে চলে থাকেন।[২,৩] এই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রসম্মত কর্ম কর্তব্যকর্ম এবং ঐ সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম অকর্তব্যকর্ম। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সকল ধর্মশাস্ত্রে যেসকল ধর্ম নিরূপিত হয়েছে, সকল যুগেই কি এই সমুদয় ধর্ম অবলম্বন করে চলতে হবে। মনু প্রণীত ধর্মশাস্ত্রে এই বিষয়ের মীমাংসা আছে।[৪]

"অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃ ণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।।" ১। ৮৫।।[৫]

পূর্ব পূর্ব যুগের লোকেরা যে-ধর্ম অবলম্বন করে চলেছিলেন, পরবর্তী যুগের লোক সে-ধর্ম অবলম্বন করে চলতে সমর্থ নয়। কারণ উত্তরোত্তর যুগে যুগে মানুষের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। কাজেই কলিযুগের লোক পূর্ব পূর্ব যুগের ধর্ম অবলম্বন করতে অক্ষম। কোন যুগে কোন ধর্ম অবলম্বন করে চলতে হবে, তার নিরূপণ পরাশর-প্রণীত ধর্মশাস্ত্রে আছে। পরাশর সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতাঃ কলৌপরাশরাঃ স্মৃতাঃ।।" ১/২৪[৬]

মনু-নিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধর্ম, গোতম-নিরূপিত ধর্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম, শঙ্খ-লিখিত ধর্ম দ্বাপর যুগের ধর্ম, পরাশর-নিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম। অর্থাৎ ভগবান মনু যে-ধর্মের নিরূপণ করেছেন, সত্যযুগের লোকেরা সেই ধর্ম অবলম্বন করে চলতেন। ভগবান শঙ্খ কর্তৃক প্রণীত ধর্ম ত্রেতা যুগের লোকেরা এবং ভগবান গোতম যে-ধর্মের নিরূপণ করেছেন, দ্বাপর যুগের লোকেরা সেই ধর্ম অবলম্বন করে চলতেন। ভগবান পরাশর যে-ধর্মের নিরূপণ করেছেন, কলিযুগের লোকজনকে সেই ধর্ম অবলম্বন করে চলতে হবে।

পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।। ৪/৩০
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।। ৪/৩১
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গ ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।।" ৪/৩২[৭,৮,৯]

পরাশর কলিযুগের বিধবাদের পক্ষে তিনপ্রকার বিধির নির্দেশ দিয়েছিলেন— বিবাহ, ব্রহ্মচর্য ও সহগমন। এই তিনের মধ্যে রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমনের প্রথা নিষেধ হয়ে গেছে। তা হলে বিধবাদের দুটিমাত্র পথ খোলা— বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য। ইচ্ছা হলে বিধবা মেয়ে বিবাহ করবে অথবা ব্রহ্মচর্য পালন করবে। পরাশর সংহিতায় বলা হয়েছে— কোনও স্ত্রীর স্বামী অনুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব স্থির হলে, সংসার পরিত্যাগ করলে অথবা পতিত হলে স্ত্রীদের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী স্বামীর মৃত্যু হলে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীদের মত স্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে-সার্ধত্রিকোটি লোম আছে, যে-নারী স্বামীর সাথে সহগমন করে, তৎসমকাল সে স্বর্গে বাস করে।[১০]

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম স্থির হল; কিন্তু বিধবার পুনর্বার বিবাহ হলে তার গর্ভজাত পুত্রের সংজ্ঞা কী হবে? সে প্রসঙ্গে পরাশর কলিযুগে ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম— ত্রিবিধ পুত্রের বিধি দিয়েছেন। বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে ঔরসপুত্র বলতে হবে, কারণ ঔরসপুত্রের যে-লক্ষণ তিনি নির্দিষ্ট করেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত—

"স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম।
তমৌরসং বিজাতীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিকম্।।" ৯। ১৬৬।। [১১]

পরাশর কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব বলে গণনা করেছেন। কাজেই বিধবাবিবাহ-যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম, তা নির্ধারিত হল। [১২]

বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম তা নির্ধারিত হল কিন্তু বিরুদ্ধগোষ্ঠী কোনপ্রকার যুক্তি দিতে না পারায় শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তখন অচলাবস্থায় পৌঁছে গেছে। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা পুনর্বিবাহ নিয়ে বিতর্ক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত না রেখে সমাজের দিকে ঘুরিয়ে দেন। ঔপনিবেশিক ভারতে বিধবা পুনর্বিবাহের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি এসেছিল সংস্কারবাদী মনন ও চিন্তা থেকে, কোনও ধর্মগ্রন্থ থেকে নয়। বিধবা পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত তাঁর বইয়ে বিদ্যাসাগর অল্পবয়সী বিধবাদের অসহনীয় কষ্টের দিকে সমাজের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। [১৩,১৪,১৫]

অবশেষে ১৮৫৫ সালের ৪ ই অক্টোবর ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে আইন পরিষদের সামনে পিটিশন করা হয়। এই খসড়া বিলের সাথে একটি আবেদন ছিল, যেটি যুক্তি দিয়েছিল যে হিন্দু বিধবাদের বিবাহকে বৈধ করার পথে যে রীতিগুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা ছিল নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক। আইন পরিষদ আশ্বাস দিয়েছিল যে ধর্মভীরু ও গোঁড়া হিন্দুদের অনুভূতি ও ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়ে নৈতিকতার স্বার্থে রীতিটি পরিবর্তন করা হবে এবং আরও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে বিরুদ্ধগোষ্ঠী সামাজিক সুবিধা পাবার আশা নিয়ে সমর্থন করেছেন, তাঁদের স্বার্থকে কোনভাবে প্রভাবিত করা হবে না।

১৮৫৫ সালের ১৭ ই নভেম্বর জে পি গ্রান্ট যে বিলটি এনেছিলেন, তা দিয়ে বিধবা পুনর্বিবাহের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ানো আইনটির ত্রুটি দূর করতে চেয়েছিলেন। আইন পরিষদ আরও আশ্বাস দিয়েছিল যে ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত না দিয়ে যেসব হিন্দু বিধবা অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন, তাঁদেরকে বিবাহের মাধ্যমে সমাজে সম্মানীয় স্থান দেওয়া হবে ।

বিধবা পুনর্বিবাহের খসড়া বিলটি বিবেচনা করার জন্য আইন পরিষদের ঘোষণার সাথে সাথে ভারতীয় অভিজাতদের মধ্যে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই বিতর্কে বিবাহ, উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোচিত হচ্ছিল। কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এই বিলের বিরুদ্ধে সবচাইতে হিংস্র আপত্তি উঠেছিল। বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একটি ভয়ঙ্কর বাকযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। সেই সময় বিভিন্ন সমীক্ষা ইঙ্গিত দেয় যে নদীয়া, যশোর ও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের কঠোর ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়া হিন্দুরা এই আইনটির ব্যাপক বিরোধিতা শুরু করেছিল।

এই সংস্কারবাদী প্রস্তাবটি সমাজকে তিনটি বিরোধীদলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। প্রথমদলে ছিল গোঁড়া হিন্দুরা, যারা সনাতন ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই বিলটির বিরোধিতা করেছিল। দ্বিতীয় দলে

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

ছিল ইংরেজি-শিক্ষিত প্রবীণ হিন্দুরা, যারা দ্বিধায় পড়ে বিলে সমর্থন করেছিল, আর শেষ দলটিতে ছিল পাশ্চাত্য মনোভাবসম্পন্ন ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু, যারা এই বিলটির উৎসাহী সমর্থক ছিল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই আইনটির বিরোধিতার প্রস্তাব এসেছিল। তাদের মধ্যে বঙ্গ প্রদেশ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এই প্রথম ধর্মান্ধতার সাথে সামাজিক রীতিনীতিকে রক্ষা করার জন্য সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকেরা এককাট্টা হতে শুরু করে। এই ঘটনা সিপাহী-বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করেছিল ।

বিধবা পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর থেকে বিদ্যাসাগরের সমর্থক গোষ্ঠী সংখ্যায় অপ্রতুল হলেও তাদের বক্তব্যগুলি ছিল জোরালো। ১৮৫৫ সালের ১লা ডিসেম্বর রাজা শ্রীশচন্দ্রের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরের হিন্দুদের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র আইন পরিষদের সামনে পেশ করা হয়, তাতে বিধবা পুনর্বিবাহ আইনটি যত দ্রুত সম্ভব বলবৎ করার প্রার্থনা করা হয়েছিল। ঠিক একইরকম আবেদনপত্র মারাঠা প্রধানের মাধ্যমে মারাঠাবাসীদের কাছ থেকে আইন পরিষদের সামনে পৌঁছেছিল। বাংলা প্রদেশ থেকে তারকনাথ সেন ও কিশোরী চাঁদ মিত্র নৈতিকতার ভিত্তিতে বিধবা পুনর্বিবাহ আইনটিকে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় আইন হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। একইভাবে কলকাতার মিশনারি পরামর্শ-সভা আইনটিকে মানবতা এবং জনসাধারণের নৈতিকতার জন্য যথাযোগ্য সম্মানের দ্বারা দাবি করেছিলেন। সে কালের বাংলায় বিধবাদের কুপথে চালিত করা একটি সাধারণ ঘটনা ছিল, যার ফলে গর্ভপাত এবং তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেবার মত ঘটনা ঘটত। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে অনেক বিধবা মহিলা আজীবন দুরবস্থার চেয়ে অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষণিকের সুখ লাভে ব্রতী হয়েছে। সমাজের এই মন্দ দিকটি যা পূর্বে সকলের চোখ থেকে এড়ানো গেলেও বর্তমানে অপ্রতিবিধেয়। মিশনারি পরামর্শ-সভা এর প্রতিকার থাকা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করেছিল।

বারাসতের আরও একটি আবেদনে লিঙ্গগত বৈষম্যকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়েছে। সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ, যেখানে বিপত্নীক পুরুষ কোন নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই পুনর্বার বিবাহ করতে পারে, সেখানে বিধবাদের আজীবন একা বেঁচে থাকতে বাধ্য করা হয়। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবকে সমর্থন করে তারা অল্পবয়সী বিধবাদের প্রতি অন্যদের ঘৃণ্য অনৈতিক কাজকর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই বিধবাদের সন্তানদের এই আইন বৈধতা দেবে, এই জন্য বিলটিকে তারা স্বাগত জানিয়েছিল ।

শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্নের মত কিছু উদারপন্থী বাঙালী আইন পরিষদের কাছে চিঠিতে এই আইনটির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন এই আইনটি হিন্দুসমাজের উন্নতিসাধন করবে।

বিলের যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী খণ্ডন এসেছে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে ছত্রিশ হাজার সাতশো তেষট্টি জন বাঙালী হিন্দুর কাছ থেকে। তাঁরা বলেছিলেন যে নাগরিক আইন আদালতে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সমাজ ভারতীয় সমাজে মিশে যাবার ঘৃণ্য চক্রান্ত করছে। তাঁরা যজুর্বেদ ও তৈত্তেরীয় শাখা থেকে উদ্ধৃত করে বিলের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তিগুলো খণ্ডন করেছেন । তাঁরা আরও বলেছিলেন যে বিভিন্ন হিন্দু উপজাতি ভিন্ন ভিন্ন রীতি , আচার ব্যবহার পালন করলেও বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই সর্বসম্মত ।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইনের প্রস্তাবিত বিল নিয়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অদ্ভুত অস্পষ্ট মনোভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল। তাদের একদিকে মনে ছিল সমাজে নতুন কিছু উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে জাগরণ তৈরি করা ও অপরদিকে ছিল শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রচলিত নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে আইনটিকে পাশ করা। মূলত দুটি বিষয় নিয়ে সমস্যা ছিল। প্রথমত, হিন্দু বিবাহের ধর্মীয় সংস্কার ও দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকার আইন নিয়ে জটিলতা।

এত জটিলতা সত্ত্বেও আইন পরিষদ বিশ্বাস করত যে ব্রহ্মচর্য পালন ছিল অসহনীয় কষ্ট এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিধিনিষেধগুলি ছিল অযৌক্তিক, অন্যায়, নিষ্ঠুর ও অনৈতিক। আইন পরিষদের আধিকারিকরা ভেবেছিলেন যে আইনটি হয়তো মৃত চিঠির মত থেকে যাবে, কিন্তু এই আইনটি সেই কুমারী অল্পবয়সী বিধবাদের রক্ষা করবে যারা মৃত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য ছিল, কিন্তু নিজের স্বামীকে কোনদিন চাক্ষুষই করেনি ।

অবশেষে নানান ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে ১৮৫৬ সালের ১৯ই জুলাই বিলটি সমস্ত আইনগত বাধা অপসারণ করে আইনে পরিণত হয় ।

বিধবা পুনর্বিবাহ আইনটি ভারতে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী আইন হিসাবে থেকে যায়। বিদ্যাসাগর ও রাষ্ট্রের ভাল উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ হয়েছিল খুব কম বিধবারই। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে আগত বিশালসংখ্যক বিধবাদের যৌন স্বাধীনতা দূরে সরিয়ে রেখে তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছিল ব্রহ্মচর্য পালনে। সমাজের উচ্চ শ্রেণির সমর্থনের অভাবে বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়টি হোঁচট খায় এবং সমাজকে শোধন করতে ব্যর্থ হয় ।

১৮৬০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত বিধবা পুনর্বিবাহের বিষয়গুলি একটি দীর্ঘ বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। সমসাময়িক স্থানীয় পত্রিকাগুলি বিদ্যাসাগরকে শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যা ও যৌন আবেশের মিথ্যা অভিযোগে তীব্রভাবে আক্রমণ শুরু করেছিল। এদের মধ্যে বেশ কিছু পত্রিকা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ক্রমেই বিতর্কের বিষয় আরও তিক্ত ও কুরুচিপূর্ণ হয়ে পড়ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাঁর জ্ঞানী পণ্ডিত ভাবমূর্তি ত্যাগ করে ছদ্মনামে এই আক্রমণের কঠোর ভাষায় জবাব দিতে শুরু করলেন। ছদ্মনামে তিনি লিখে ফেললেন 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'বিষয়িনী', 'ব্রজবিলাস' এবং 'রত্নপরীক্ষা'। এদের মধ্যে বেশ কিছু রচনা ভীষণ জনপ্রিয়।

বিধবা পুনর্বিবাহ আইনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলি নিয়ে ১৮৯১ সালে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তখনকার পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব যেমন মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন প্রমুখের সাথে তর্কযুদ্ধ করতে হয়েছিল। পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন বলেছিলেন যে সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ধর্মশাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে এরকম অযৌক্তিক ভাবনা স্থাপনের প্রয়াস হাস্যকর। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রশ্ন তোলেন প্রায় ত্রিশ বছর আগে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-কর্তৃক গৃহীত আইনটি কি শাস্ত্রীয় যুক্তিতে অকাট্য ছিল? তাঁর মতে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। তিনি এও বলেছিলেন যে এই আইনের ফলে বিধবা ও বেশ্যাদের মধ্যে কোন প্রকারভেদ থাকবে না। তাহলে কি সমাজসংস্কারক (বিদ্যাসাগর) এরপর বেশ্যাদেরও বিবাহে প্রবৃত্ত হবেন !

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

বিদ্যাসাগর সমাজকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে একপ্রকার আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে রাষ্ট্র ও সামাজিক কর্তৃত্ব একই শাসনতন্ত্রের প্রতিবিম্ব। কিন্তু তাঁর বুঝতে ভুল হয়েছিল যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও হিন্দুসমাজ ক্ষমতার বিভিন্ন ক্ষেত্র দখল করে রয়েছে। রাষ্ট্র বলপূর্বক আইন পাশ করে দিলেও পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে পারেন নি বলেই হয়তো ব্যর্থ হয়েছিলেন। সমষ্টিগত আক্রমণের মুখেও তিনি ব্রাহ্মণসমাজে তাঁর স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করেননি। এখানেই প্রকাশ পায় তাঁর দৃঢ়তা, মহত্বতা এবং একইসঙ্গে তাঁর ব্যর্থতা।

১৮৫০ এর দশকে বিধবা পুনর্বিবাহের নিষেধাজ্ঞাগুলি শাস্ত্রীয় অনুমোদনের ওপরই ভিত্তি করেছিল। কিন্তু বিধবাদের অবদমিত যৌনজীবনের ওপর সংস্কারকের দ্বিধাহীন যুক্তি মহিলাদের যৌনতা বিষয়ে সবচেয়ে বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মতে, কঠোরভাবে মহিলাদের যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ না করলে তা সবচেয়ে শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক হিসাবে বিবেচিত হবে। বিবাহ ছিল একে নিয়ন্ত্রণ করার সুকৌশল উপায়, এবং একই সাথে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি মহিলাদের অসমঞ্জস একনিষ্ঠতা রাখার আদেশ করত। বিদ্যাসাগর নিশ্চিত করেছিলেন যে বিধবাদের যৌনতা নিয়ন্ত্রণের চিরাচরিত সামাজিক কৌশলগুলি দিন দিন বিশৃঙ্খলিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়েছে এবং বিবাহই এর একমাত্র সমাধান। বিধবা পুনর্বিবাহের ওপর বিদ্যাসাগরের কর্মসূচীর মূল ভিত্তিই ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-কর্তৃক মহিলাদের যৌনতা নিয়ন্ত্রণের ন্যায়সঙ্গত উপায় হিসাবে বিবাহকে উচ্চমূল্য প্রদান, কারণ বিবাহই ছিল হিন্দু মহিলাদের সামাজিক পরিচয়ের বৈধ মাধ্যম। বিরোধীরা এই সমাধানে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল এই ভেবে যে বিধবাদের পুনর্বিবাহ দিলে ধর্ম সংস্কার দুর্বল হয়ে পড়বে। আসলে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি ব্যবস্থার ওপর আঘাতের পর সনাতনপন্থীরা বিবাহ ব্যবস্থার ওপর আরও কোনও পরিবর্তন হতে না দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিতর্কের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গিয়ে আসল লক্ষ্য থেকে সরে গেলেও বিধবা পুনর্বিবাহ নিয়ে সামাজিক বিতর্ককে জনসাধারণের সামনে প্রশস্ত করতে সফল হয়েছিলেন। বহু প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ১৮৫৫ সালে xv আইনটি (বিধবা পুনর্বিবাহ আইন) সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিজয়-স্মারক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৮৫০ এর দশকে বিদ্যাসাগরের নানাবিধ সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে এই আইনটি ছিল সমাজে মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই আইন ব্রিটিশদের হিন্দু সমাজব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেছিল, যা পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ব্রিটিশরা বিশ্বাস করত যে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন প্রয়োগের ক্ষোভ সিপাহী বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল এবং পরবর্তীকালে কোনরূপ সমাজ সংস্কার থেকে তারা দূরে থেকেছে। এই সংস্কারের যুগে অভিজাতগণের এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া পরবর্তীকালে হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়।

তথ্যসূত্র

১. শর্ম্মা, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, প্রথম প্রকাশ, সত্যম, কলকাতা, ১৪২৫, পৃষ্ঠা - ৩৭৭
২.তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৮২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৮৪
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, (টীকা), *মনুসংহিতা*, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা - ৪৯
৫.তদেব, পৃষ্ঠা – ৫২

৬. ত্রিপাঠি, পণ্ডিত সুন্দর লাল, (টীকা), *অষ্টাদশ স্মৃতি*, মার্চ ২০১৮, ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রকাশন, মুম্বাই, ৪০০০০৪, পৃষ্ঠা - ২৬৬
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬৬
৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮৪
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, (টীকা), *মনুসংহিতা*, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা – ১৬৩
১০. ত্রিপাঠি, পণ্ডিত সুন্দর লাল, (টীকা), *অষ্টাদশ স্মৃতি*, মার্চ ২০১৮, ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রকাশন, মুম্বাই, ৪০০০০৪, পৃষ্ঠা - ২৮৬
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, (টীকা), *মনুসংহিতা*, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা – ২৬৬
১২. ত্রিপাঠি, পণ্ডিত সুন্দর লাল, (টীকা), *অষ্টাদশ স্মৃতি*, মার্চ ২০১৮, ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রকাশন, মুম্বাই, ৪০০০০৪, পৃষ্ঠা - ২৮৭
১৩. শর্ম্মা, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, প্রথম প্রকাশ, সত্যম, কলকাতা, ১৪২৫, পৃষ্ঠা - ৩৯১
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৯৮
১৫. তদেব পৃষ্ঠা – ৪০৭

সহায়ক গ্রন্থ

১. সরকার, বিহারিলাল, *বিদ্যাসাগর*, বাণীনাথ নন্দী, ১৩০২ ।
২. বোস এস কে , *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৪।
৩.*বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, সত্যম, কলকাতা, ১৪২৫ ।
৪. ঘোষ বিনয়, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৩৬৪।
৫. মিত্র, ইন্দ্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০ ।
৬. সেনগুপ্ত, পল্লব ও চক্রবর্তী, অমিত, বিদ্যাসাগরঃ একুশ শতকের চোখে, এশিয়াটিক সোসাইটি, মে ২০০৩ ।
৭. Mitra, Subal Chandra, *Isvar Chandra Vidyasagar: Story of His Life and Work*, Rupa Publications India, 2008.
৮. Sen, Asok, *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones*, Riddhi-India, 1977
৯. Umar, B, *Ishwar Chandra Vidyasagar O Unish Shataker Bangali Samaj*,Chiryata Prokashan Pvt.Ltd, Kolkata. 1985 .
১০. *Widow Remarriage Papers*, from R.N.C Hamilton, agent, Governor General of Central India, Indore, to William Muir, Secretary to the Government, N.W.Provinces, Agra, 29th February 1856
১১. *Widow Remarriage Papers*, from Edward Storrow, Chairman and D. Ewart, Secretary of the Calcutta Missionary Conference to the Secretary to the Legislative Council, Calcutta, 19 December, 1855 .
১২. *'The bill of Marriage of Hindoo Widows'* , prepared and brought in by J.P Grant, Secretary to the Legislative Council .
১৩. *Widow Remarriage Papers*, letter to the Honourable Legislative Council by certain Hindoo inhabitants of the province of Bengal submitting a Draft Bill for legalizing the marriage of Hindu widows, 1855.